|| শ্রীহরি ||

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দেজগদ্গুরুম্।।

॥ गीता पढ़ें, पढ़ायें, जीवन में लायें ॥

|| শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিবেচন সারসংক্ষেপ ||

অধ্যায় 15: পুরুষোত্তমযোগ

1/2 (শ্লোক 1-6), শনিবার, 17 আগস্ট 2024

ব্যাখ্যাকার: গীতা বিশারদ ড: আশু গোয়েল মহাশয়

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/nqfw-_c44rs

লক্ষণই হলো ভক্তের পরিচয়

পরম্পরাগত নাম সংকীর্তন , হনুমান চালিসা পাঠ , দীপ প্রজ্জ্বলন , শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা এবং শ্রীগুরু চরণ বন্দনা করে পঞ্চদশ অধ্যায়ের পূর্বার্দ্ধ বিবেচন সত্র আরম্ভ হলো ।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আমাদের জীবনের সার্থক করার উদ্দেশ্যে, জীবনের পরম লক্ষ্য প্রাপ্ত করার জন্য, ইহলোক এবং পরলোকে বিজয়ী হওয়ার জন্য, মানব জন্মের উত্থানের জন্যই আমরা শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা পাঠে এবং চিন্তনে ও মননে প্রবৃত্ত হয়েছি। জানা নেই, এ আমাদের পূর্ব জন্মকৃত সুফল না কি এই জন্মে কোন মহান সন্তের শুভ দৃষ্টি আমাদের উপর নিবদ্ধ হয়েছে যা আমাদের এই সৌভাগ্য প্রদান করেছে ; আমরা ভগবদ্গীতার সান্নিধ্য লাভ করেছি ।

সর্বদা এটাই মনে রাখতে হবে যে আমাদের সাধ্য নেই ভগবদ্গীতা কে নির্বাচন করার, বরং, শ্রী গীতাই কৃপা করে আমাদের চয়ন করেছেন। তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ ভগবদ্গীতা কে পড়া তো দূর -- স্পর্শ ও করতে পারে না। এর প্রমাণ শ্রী ভগবান আঠারো অধ্যায়ে নিজেই দিয়েছেন -- **মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।**

এর অর্থ হলো -- যে গীতা অধ্যয়ন করে , সে আমাকে প্রাপ্ত করে৷ ভাবার বিষয় হলো যে ঈশ্বর কে প্রাপ্ত করা কি এতো সহজে সম্ভব ?

কোন এক সময়ে ঋষিকেশে ব্রহ্মালীন স্বামী রামসুখদাস জীর প্রবচন চলছিল। সকাল এবং সন্ধ্যায় এই প্রবচন হতো । একটি সত্রে স্বামীজী ঘোষণা করলেন -- যত ভক্ত এখানে একত্রিত হয়েছে, সকলের ভগবদ প্রাপ্তি বা মোক্ষ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। ১০৩ বর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞানী, সিদ্ধপুরুষ --- তাঁর শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত এই কথা উপস্থিত হাজার সংখ্যক ভক্তের মনে প্রবল উৎসাহ এনে দিল। কিছুক্ষণ মৌন থেকে স্বামীজী বললেন -- গীতা পাঠ করলে ভগবদ প্রাপ্তি তো সুনিশ্চিত -- কিন্তু কতদিনে তা প্রাপ্ত করবে তা নির্ভর করবে প্রত্যেকের গতি এবং ইচ্ছার প্রাবল্যের উপর। গতি এবং উৎসর্গের ইচ্ছা যদি অত্যন্ত দৃঢ় হয়, তাহলে এই জন্মেই। নতুবা অন্য অনেক জন্ম ধরে লেগে থাকতে হবে। স্বামীজী এটাই বলতে চেয়েছেন যে ভক্তেরা সঠিক পথ ধরে চলছে। ধরা যাক, কেউ মুম্বাই থেকে দিল্লি যাবে। সে সঠিক রাস্তা ধরে চললে অবশ্যই দিল্লি পৌঁছে যাবে -- কিন্তু কবে পৌঁছাবে তা অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে --- আমরা যদি অবিচল ভাবে তীব্র গতিতে এই পথে চলতে থাকি, তাহলে পরমধাম প্রাপ্তি সুনিশ্চিত ।

সাতশো শ্লোক বিশিষ্ট ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থ হলো গীতা। গীতাপ্রেস তো একে একটা দেশলাই বাক্সের আকার ও দিয়েছে। এতো ছোট -- কিন্তু এতো শক্তিশালী এই গ্রন্থ যে গত পাঁচ হাজার তিনশো বছর ধরে শুধু ভারতের নয়, বিদেশি দার্শনিকেরাও গীতার মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন। গীতা প্রেসের সংস্থাপক -- পরম শ্রদ্ধেয় শেঠ জয়দয়াল গোয়েঙ্কা জী শ্রীমদ্ভাগবতগীতা র মুখবন্ধে লিখেছেন যা নিজের জন্য সবচেয়ে মহৎ কাজ ; কারণ, তিনি সর্ব শাস্ত্রের যা সার -- হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করে হিন্দু সমাজের কল্যাণ করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতে ভাগবদগীতা , রামায়ণের মতো ধর্মগ্রন্থ সবাই সহজে পেয়েছে। শেঠজী প্রস্তাবনায় লিখেছেন সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে যে শ্রীমদ্ভাগবতগীতা তুল্য কল্যাণকারী গ্রন্থ আর দ্বিতীয় কিছু নেই।

সমস্ত বেদের সার হলো উপনিষদ এবং উপনিষদের সার হলো ভগবদ্গীতা। শ্রী ভগবান সমস্ত উপনিষদ দোহন করে গীতার উপদেশ দিয়েছেন।

সর্বোপনিষদো গাবো, দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ।

আমাদের আচার্য পরম্পরায় শ্রী রামানুজাচার্য জী লিখেছেন --

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা পাঠ করা হলে আর কোন শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য শাস্ত্র নির্দিষ্ট কোন মার্গ দর্শন করায় ; কিন্তু , ভগবদগীতা ইহলোকের সাথে পরলোকের জন্য যা হিতকরী... সেই পথও দেখায়। এই গ্রন্থ পাঠ করার পরে মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে, এমনকি পরম ধামের দ্বার ও খুলে যেতে পারে।

এই গ্রন্থ কোন মার্গে যাওয়ার জন্য জোর করে না। শ্রীভগবান কখনো কোনো কাজ যে বাধ্যতামূলক তা ও বলেননি। তিনি কেবল লক্ষণ সমূহের উপর দৃষ্টিপাত করিয়েছেন। কোন কর্ম করলে তার প্রভাবের প্রতি সংবেদনশীল হতে শিখিয়েছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে তিনি ভক্তের উনচল্লিশটি লক্ষণের বিষয়ে বলেছেন --- কিন্তু, কোথাও বলেন নি যে তিলক লাগাতে হবে বা টিকি রাখতে হবে , অথবা বলেন নি যে হাতে তালি বাজিয়ে জোরে জোরে কীর্তন করলে তবেই বোঝা যাবে সে মস্ত বড়ো ভক্ত। দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩ নম্বর থেকে ১৯ নং শ্লোকের মধ্যে আসল ভক্তের লক্ষণ বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে।

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং, মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ, সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ।। (১২.১৩)

শ্রী ভগবান কোথাও কোন পূজা বিধি বা জপ-তপ-উপবাস ইত্যাদির কথা বলেননি। আমাদের কর্মের কি প্রভাব.. আমাদের স্বভাব বা ব্যবহারের কি কি পরিবর্তন হচ্ছে বা আমাদের সাত্ত্বিকভাব কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে --- এসব তিনি একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের মতো পর্যবেক্ষণ করেছেন।

যেমনভাবে একজন চিকিৎসক রোগীর পরীক্ষা করে শুধু রোগের মূল কারণ বুঝে নেন -- রোগীর কষ্টের কাহিনির দিকে তেমন মন দেন না --- কেবল রোগের উপসর্গ গুলো নজর করেন --- তেমনই শ্রীভগবান শুধুমাত্র লক্ষণ সমূহ বোঝাতে চেয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবতগীতা কেবলমাত্র পরিণাম কে প্রাধান্য দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রী ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের সংজ্ঞা দিয়েছেন , ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি জ্ঞানীর লক্ষণ কি কি তা বলেছেন , চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের লক্ষণ বুঝিয়েছেন এবং ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী গুণের লক্ষণ সমূহ বুঝিয়েছেন।

সম্পূর্ণ গীতায় শ্রীভগবান স্পষ্ট করে বলতে চেয়েছেন -- যে কোন মার্গেই চলো না কেন... যদি তা সঠিক হয় তা হলে সফল হবেই। ঘন্টার পর ঘন্টা পূজা করার পরেও যদি কেউ অসত্য কথা বলে বা অসত্য উপায় নিয়ে অন্যদের ঠকায় , ঈর্ষা করে বা ষড়যন্ত্র করে --- তবে সেই পূজা অর্চনা ভক্তের লক্ষণ নয়।

কোন কোন সাধকের মনে হতে পারে ... শ্রীভগবান কেন অর্জুন কে ই গীতার জ্ঞান দিয়েছেন --- যুধিষ্ঠির তো ধর্মরাজ ; তাঁকে কেন শোনান নি?

অর্জুন কে শ্রীভগবান অনেক নামে সম্বোধন করেছেন। পার্থ নামে তো বহুবার সম্বোধন করেছেন এবং অর্জুনের দুটি বিশিষ্ট গুণের প্রশংসা করেছেন ।

যেমন - **অনঘ**, অর্থাৎ যে পাপ করেনি। পূজনীয় স্বামীজী মহারাজ বলেন... সম্পূর্ণ মহাভারতে অর্জুন কোন অনুচিত কথা বলেননি বা কোন অনুচিত কাজ করেছেন। মহাভারতে সকলেই মর্যাদা পালন করেছেন ; কিন্তু যুধিষ্ঠির কে কটূ কথা ও বলেছেন। শুধু অর্জুন তাঁকে সর্বদা জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের সম্মান দিয়েছেন -- একবারও নিজের মত আরোপ করেননি। মহাভারতের স্বাধ্যায়কারী গণ অর্জুনের চরিত্র দ্বারা খুবই প্রভাবিত হন।

পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে অর্জুন সবচেয়ে পরাক্রমশালী ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের জন্য ধনরাশি একত্র করার উদ্দেশ্যে চার ভাই চারদিকে গিয়েছিলেন । অন্য তিন ভাই যা ধনরাশি আহরণ করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি আহরণ করেছিলেন অর্জুন একাই । এজন্য তাঁকে ধনঞ্জয় বলা হয়েছে।

নিজের পরাক্রম দ্বারা অর্জুন স্বয়ং মহাদেব কে ও প্রসন্ন করেছিলেন। মল্লিকার্জুন গিরির উপর দশদিন ধরে অর্জুন ও মহাদেবের মল্ল যুদ্ধ চলেছিল। মহাদেব কে তো কেউই পরাজিত করতে পারবে না ; কিন্তু, নিজের পরাক্রমে অর্জুন ও পরাজিত হননি । হায়দ্রাবাদের কাছে এ এক পূণ্য তীর্থক্ষেত্র।

বিরাট রাজার হয়ে যুদ্ধেও অর্জুন একাই কৌরব সেনাবাহিনী কে পরাস্ত করেছিলেন। রাজকুমার উত্তরের সারথি হয়ে বৃহন্নলা রূপে যুদ্ধে গিয়ে আপন পরাক্রমে কৌরব পক্ষকে পরাজিত করেন। এতো বলশালী হয়েও অর্জুন দাম্ভিক ছিলেন না।

অর্জুনের আরেকটি বিশেষত্ব ছিল -- তিনি কারও নিন্দা করতেন না -- এজন্য শ্রীভগবান তাঁকে *অনুসূয়* বলেছেন। সুপাত্র বলেই শ্রীভগবান অর্জুন কে শ্রীমদ্ভাগবতগীতা শুনিয়েছেন।

মহাভারতের যুদ্ধে অভিমন্যু কে অন্যায়ভাবে বধ করা হয়েছিল। সন্ধ্যায় যখন অর্জুন এই নৃশংস ভাবে হত্যার কথা শুনলেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন পরদিন সূর্যাস্তের আগেই জয়দ্রথ কে বধ করবেন -- নতুবা নিজে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবেন। এর পরে তিনি শয়ন কক্ষে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন । অর্জুনের এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তিত করে তুললো। ভগবান ঘুমাতে পারলেন না। মাঝরাত্রে তিনি অর্জুনের শয়নকক্ষে এসে দেখেন অর্জুন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন। তিনি অর্জুনের ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন -- হে পার্থ, তুমি কিভাবে এতো নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছ? অথচ, তোমার প্রতিজ্ঞা আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছে -- অর্জুন স্মিত হেসে বললেন -- হে মধুসূদন, যার জন্য আপনি চিন্তা করছেন, তার আবার কিসের চিন্তা ? আমি তো নিশ্চিত -- আমার প্রতিজ্ঞা আপনি সফল করবেন। অতএব আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে পারি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর আগে যখন দুর্যোধন এবং অর্জুন দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের দরবারে গিয়েছিলেন, সেখানে অর্জুন শুধু নিরস্ত্র কৃষ্ণ কেই চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন -- হে কেশব, আপনি আমার সাথে থাকলে আমি ত্রিলোকের দেব - দানব কে ও পরাজিত করতে পারি। দুর্যোধন কিন্তু এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সৈন্য পেয়েই অতি প্রসন্ন হয়ে গেলেন। নিরস্ত্র কৃষ্ণ কে অর্জুন চেয়েছিলেন -- এটাই তাঁর প্রেম -ভক্তির প্রমাণ।

শ্রীভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন --

ভক্তোঽসি মে সখা চেতি, রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ।। (৪/৩)

হে অর্জুন! তুমি আমার ভক্ত ও এবং সখা ও । ভক্তের যে প্রেম ভগবানের প্রতি -- তা স্বাভাবিক ব্যাপার , কিন্তু শ্রীভগবানের ও অর্জুনের প্রতি যে প্রেম - তা অতি বিশিষ্ট ।

খাণ্ডব বন দহন কালে ভগবান ইন্দ্র এবং অগ্নিদেবতা অর্জুন কে দিব্য রথ ও গাণ্ডীব ধনু উপহার দিয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কে বিনীত ভাবে বলেছিলেন -- আপনি তো স্বয়ং পরমেশ্বর... আপনাকে আর কি উপহার দিতে পারি? শ্রীভগবান অত্যন্ত বিনম্র ভাবে একটি অদ্ভুত বর প্রার্থনা করেছিলেন -- যেন অর্জুন এবং তাঁর প্রীতি বন্ধুত্ব অখণ্ড থাকে।
এটা তো এক অনন্য উদাহরণ -- যেখানে ভগবান নিজে ভক্তের প্রীতি চাইছেন ; এবং এই উদাহরণই প্রমাণ করে অর্জুন কতটা বিশেষত্ব ধারণ করতেন।

এভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কে সম্পূর্ণ গীতা শোনাননি , অর্জুন তো তাঁর একটা ইশারা বা ইঙ্গিতে সবকিছু বুঝে নিতেন -- কারণ, অর্জুন সমস্ত দৈবী গুণসম্পন্ন ছিলেন । শ্রীভগবান অর্জুন কে নিমিত্ত করে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কে উদ্ধার করতে গীতা শুনিয়েছিলেন।

15.1

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃ(শ্) শাখম্, অশ্বত্থং(ম্) প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি য়স্য পর্ণানি, য়স্তং(ৱঁ) বেদ স বেদবিৎ॥15.1॥

শ্রীভগবান বললেন –ঊর্ধ্বে মূলযুক্ত এবং নিম্নে শাখাবিশিষ্ট যে জগৎরূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে (প্রবাহরূপে) অব্যয় বলা হয় এবং বেদ যার পল্লবসমূহ, সেই জগৎবৃক্ষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় দ্বাদশ এবং পঞ্চদশ অধ্যায় সবচেয়ে ছোট। দ্বাদশ অধ্যায়ে কুড়িটি শ্লোক আছে যার সবগুলোই অনুষ্টুপ ছন্দবদ্ধ। পঞ্চদশ অধ্যায়েও শ্লোক সংখ্যা কুড়ি -- কিন্তু , তার মধ্যে কিছু শ্লোক আছে ত্রিষ্টুপ ছন্দে।

অনুষ্টুপ এবং ত্রিষ্টুপ ছন্দ কি ?
অনুষ্টুপ ছন্দ আট-আট মাত্রাযুক্ত, চারটি চরণ বিশিষ্ট -- যাতে বত্রিশ টি অক্ষর আছে।
ত্রিষ্টুপ ছন্দেও চারটি চরণ আছে, কিন্তু তা এগারো মাত্রা বিশিষ্ট। এরূপ চুয়াল্লিশটি অক্ষর দ্বারা চারটি চরণ বিশিষ্ট ছন্দ হলো ত্রিষ্টুপ। এই অধ্যায় ছোট হলেও খুব প্রভাবশালী। শ্রীভগবান একে শাস্ত্রের উপমা দিয়েছেন --
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্, ইদমুক্তং ময়ানঘ।

মহাপুরুষগণ এরকমই পরম্পরা তৈরি করেছেন যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হোক বা শোকের আবহ হোক -- ভোজন গ্রহণ শুরু করা বা যাত্রার সূচনা কালে এই অধ্যায় পাঠ করা সঠিক। এই অধ্যায়ের গুরুত্ব এইজন্য বেশি -- কারণ এতে শ্রীভগবান নিজের গোপনীয় পুরুষোত্তম স্বরূপ এর বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন এবং সেই কারণে এই অধ্যায় কে **পুরুষোত্তমযোগ** বলা হয়েছে ।

এই বৃক্ষের বর্ণনা করে শ্রীভগবান বলেছেন , এমন একটি বৃক্ষ -- যার মূল (শিকড়) উপর দিকে এবং শাখা নিচের দিকে। এখানে উপর মানে শুধু দিক নির্দেশ করে না -- উচ্চতাও বোঝায়। ধরা যাক, কোন বিদ্যার্থী দ্বিতীয় শ্রেনী থেকে তৃতীয় শ্রেনীতে উত্তীর্ণ হয়েছে -- তাকে বলা যায় উঁচু ক্লাসে উঠেছে। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে তার ক্লাসরুম ও উঁচুতে হবে। সেটা নিচের তলায় ও হতে পারে -- দ্বিতীয় শ্রেণীতে তার ক্লাসরুম হয়তো তিনতলায় ছিল। অর্থাৎ -- এখানে উঁচু শ্রেণীর অর্থ উচ্চ অবস্থা।

এখানে যে বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে - তার শিকড় উপর দিকে এবং শাখা পাতা ইত্যাদি নিচের দিকে --- এটা শুধুমাত্র কল্পনা করা হয়েছে। বাস্তবে এমন গাছ নেই। কিন্তু যদি মানব শরীর কে ধরা হয়, তাহলে এই গাছের বর্ণনা স্পষ্ট বোঝা যাবে। মানুষের হাত বা পা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যদি কেটে বাদ দেওয়া হয় , তাহলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে । কিন্তু যদি মাথা বাদ চলে যায় কোন কারণে --- তাহলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কোনভাবেই নেই ।

এবার বৃক্ষের ক্ষেত্রেও যদি তার ডালপালা, পাতা, ঝুরি ইত্যাদি কেটে ফেলা হয়... তাতেও গাছ বেঁচে থাকে , কিন্তু যদি তার শিকড় কেটে দেওয়া হয় তাহলে আর সে বাঁচে না। অর্থাৎ , মানুষের মাথার সাথে গাছের মূলের তুলনা করা যায় । কেবল আমাদের মাথা শীর্ষে থাকে আর মূল মাটির নিচে থাকে ।

শ্রীভগবান সংসার বৃক্ষ কে অশ্বত্থ বলেছেন । **অশ্বত্থ** -- **অ** + **শ্ব** এর অর্থ হলো যা কাল অবধি থাকবে না। যা প্রতি মূহূর্তে বদলে যায় । বেদান্ত অনুযায়ী সংসারের পরিভাষা হলো --

সংসৃতি ইতি সংসার

অর্থাৎ, সংসার প্রতিক্ষণে বদলে যায়। এক মূহূর্ত আগে সংসার যেমন ছিল, এখন আর তা নেই।

এর উপমা শ্রীভগবান অশ্বত্থ গাছের দিয়েছেন । কারণ, এই গাছের পাতা সর্বদাই নড়াচড়া করে --- যখন হাওয়া নেই কোথাও -- তখনও এর পাতা দোলে।

শ্রীভগবান সংসারবৃক্ষ কে অব্যয় বলেছেন । অবিনাশী -- যার শুরু ও নেই , শেষ ও নেই । যা নিত্য, সনাতন।

যদি এক টুকরো কাগজ কে কেউ নষ্ট করতে চায় --- কিভাবে করবে ? ছিঁড়ে ছোট ছোট টুকরো হবে... কিন্তু শেষ হয়ে যাবে না । জলে ভিজে যেতে পারে , কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না , যদি আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় তা কার্বন ডাই-অক্সাইড এ পরিবর্তিত হবে, কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যাবে না। এভাবে পুরো ব্রহ্মাণ্ড ই অব্যয়ী। কখনও নষ্ট হয়ে যাবে না কেবল রূপান্তরিত হবে । পৃথিবীতে জীবের সংখ্যা বাড়া বা কমার সাথে পৃথিবীর ওজন বাড়ে- কমে না । সুতরাং , সংসার পরিবর্তনশীল... কিন্তু অব্যয়।

ছন্দাংসি য়স্য পর্ণানি -- জ্ঞান হলো এই বৃক্ষের পাতা । যেমন অশ্বত্থ গাছের পাতা অগুন্তি...অনন্ত -- জ্ঞান ও তেমনই অনন্ত ।

য়স্তং বেদ স বেদবিৎ -- যে এর জ্ঞান গ্রহণ করে - তাকে জ্ঞানী বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা জানার পরিধি বিভিন্ন প্রাণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন। কারও কাছে গীতা হলো আদালতে বয়ান দেওয়ার আগে সত্যের শপথ নেওয়ার একটি বস্তু মাত্র । কেউ বলবে -- আমি তো লার্ন গীতা পরিবারে গীতা শিখেছি --- এই ব্যাপার টা আমার জানা । আঠারো টি অধ্যায়, সাতশো শ্লোক, কৃষ্ণ - অর্জুন সংবাদ... ইত্যাদি । কেউ হয়তো গীতার অর্থ কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। আবার এমন মানুষ ও আছেন -- যেমন পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীজি মহারাজ --- যিনি গীতা কেবল পাঠ করেন বা শোনেন না... গীতাতেই বাঁচেন। তাঁর জীবনের প্রতি কোণে গীতার ঝলকানি। সুতরাং, সকলের জানার স্তর আলাদা আলাদা হতে পারে এবং তাতে নিহিত পরিণাম ও আলাদা হবে। এটাই নির্দিষ্ট ভাবে জানতে হবে যে আমরা কোন স্তরে রয়েছি ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা দারুণ ঘটনা বলবো । কুড়ি - পঁচিশ বছর আগে স্বামীজী মহারাজ চেন্নাই গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটি পাঁচ বছরের বালক কে দেখলেন ইংরাজী পেপার পড়ছে। স্বামীজী আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন -- তুমি ইংরাজী পড়তে জানো? শিশুটি উত্তর দিল - হ্যাঁ। স্বামীজী তাকে পেপার পড়ে শোনাতে বললেন ... বাচ্চাটি পড়তে লাগলো -- T H E T I M E S O F I N D I A (The Times Of India) বাচ্চাটি কেবল অক্ষর চেনে -- সে শব্দ জানে না। কিন্তু, তার মনে হচ্ছে সে ইংরেজি পড়তে জানে -- মানে, তার দৃষ্টিতে সে জ্ঞানী । কিন্তু স্বামীজীর দৃষ্টিতে সে পূর্ণরূপে জ্ঞানী নয়। একইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতগীতা জানার স্তর ও আলাদা আলাদা।

15.2

অধশ্চোর্ধ্বং(ম্) প্রসৃতাস্তস্য শাখা,
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি,
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে।।2।।

ওই জগৎ-বৃক্ষের গুণাদির (সত্ত্ব, রজঃ ও তমো) সাহায্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিষয়রূপ পল্লববিশিষ্ট শাখাগুলি নীচে, মধ্যভাগে ও ঊর্ধ্বে সর্বত্র বিস্তৃত। মনুষ্যলোকে কর্মানুসারে বন্ধনকারী মূল নিম্নে ও ঊর্ধ্বভাগে সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে চলেছে।

শ্রীভগবান বলেছেন -- হে অর্জুন! এই অশ্বত্থ গাছের ঊর্ধ্ব মূলে আমি আছি। (এখন এঁনাকে সাকার রূপে ভাবো বা নিরাকার রূপে , ব্রহ্ম ভাবো , আপন ইষ্টদেবতা ভাবো , পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভাবো বা যা-ই ভাবো ।) ব্রহ্মা জী এই বৃক্ষের প্রধান কাণ্ড। ব্রহ্মা জী দ্বারা ত্রিগুণের সৃষ্টি হয়েছে -- সত্ত্ব , রজো ও তমোগুণ। এই বৃক্ষের বিস্তারও এই তিন গুণ দ্বারাই হয়েছে। সমস্ত সংসার এই তিন গুণ দিয়ে তৈরি।

এই তিন গুণের মিশ্রনে গঠিত হয়েছে তিন মুখ্য যোনি -- দেব, মনুষ্য এবং তির্যক যোনি। যা উপরের দিকে যায় -- তা হলো দেবযোনি , যা মধ্যে থাকে, তা হলো মনুষ্য যোনি এবং যা নিচের শাখার দিকে যায় - তা হলো তির্যক যোনি। যেমন -- পশু, কীট -- নরক বা পাতাল ইত্যাদির যোনি।

এই ব্রহ্মাণ্ডে চৌদ্দ টি লোকের কথা বলা হয়েছে ।

১) সত্যলোক
২) তপলোক
৩) জললোক
৪) মহৎ লোক
৫) স্বর্গলোক
৬) যুবলোক
৭) মনুষ্যলোক

৮) অতললোক
৯) পাতাললোক
১০) বিতললোক
১১) সুতললোক
১২) তলাতললোক
১৩) মহাতললোক
১৪) রসাতললোক

এই চৌদ্দ লোকের মধ্যে মনুষ্য লোক সপ্তম স্থানে অবস্থিত। এর উপরের ছয় লোক হলো দেবলোক এবং মনুষ্য লোকের নীচের ছয়টি লোক তির্যক যোনির জন্য।

ছন্দ হলো এর পাতা , অহংকার, মমতা এবং বাসনা হলো এর মূল -- যা নীচে -উপরে সব লোক জুড়ে বিচরণ করে এবং সকলকে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। " **আমি এবং আমার** " - এই জালে জড়িয়ে রাখে । বিদেশে কোন যুদ্ধে কত সৈনিক মারা গেল -- তা আমাদের মনে অত প্রভাব ফেলে না --- যতটা আমরা উদ্বেল হয়ে পড়ি আমাদের কাছের কেউ মারা গেলে ... কারণ, "**আমি এবং আমার** " এই বন্ধনে জুড়ে গেছি , কর্মের বন্ধনে জুড়ে গেছি । মৃত্যু তো সবারই হয়েছে । ইচ্ছার বাঁধনে জুড়ে থাকা হলো বাসনা।

এই তিন গুণ দ্বারা পঞ্চ মহাভূত নির্মিত হয়েছে । আর পঞ্চ মহাভূত দ্বারা পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়েছে -- শব্দ , রস, রূপ , স্পর্শ এবং গন্ধ ।

15.3

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে,
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং(ম্) সুবিরূঢমূলম্,
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢেন ছিত্ত্বা।।3।।

এই সংসার-বৃক্ষের যেমন রূপ দেখা যায়, বিচার করলে তেমন উপলব্ধ হয় না; কারণ এর আদি-অন্ত বা স্থিতি কিছুই নেই। তাই এই সদৃঢ়মূল জগৎ-সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে দৃঢ় অনাসক্তিরূপ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করে।

শ্রীভগবান বলেছেন -- হে অর্জুন ! এই সংসার রূপ বৃক্ষের কথা আমি যেমন বললাম তেমনটি নয়। আমি তো শুধু একটা উদাহরণ দিয়েছি মাত্র। এই বৃক্ষের শুরু এবং শেষ দুটোই দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু, আমার ব্রহ্মাণ্ডের কোনো আদি বা অন্ত নেই। এ হলো অনন্ত সৃষ্টি। এই বৃক্ষের তো একটা আকার দেখা যাচ্ছে ; কিন্তু, আমার যে ব্রহ্মাণ্ড -- *ন সম্প্রতিষ্ঠা*- দেখাও যায় না । এ অবিরত রূপ বদল করে।

এই বৃক্ষের মূল হলো -- অহংকার, মমতা এবং বাসনা। এগুলো মূল থেকে তুলে ফেলতে হলে অসঙ্গ শাস্ত্রের প্রয়োজন।

চৌদ্দ লোকের জ্ঞান আমরা পেয়েছি। অসংখ্য যোনি -- স্থলচর, জলচর, খেচর , অণ্ডজ , স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি বোঝা , পঞ্চ মহাভূত দ্বারা নির্মিত মানব শরীর কে বোঝা । দেব শরীর কেবল আলোক স্বরূপ হয়। ভূত-প্রেত ইত্যাদি কেবল বায়ু দ্বারা নির্মিত । অনেক সংখ্যক পা বিশিষ্ট কীট আছে, আবার গাছপালা ও আছে , জীবাণু আছে। সব মিলিয়ে চুরাশি লক্ষ যোনি আছে যা তিন গুণ দ্বারা নির্মিত।

আপন কর্ম অনুযায়ী মানুষ যোনি প্রাপ্ত করা সম্ভব এবং এই চক্র কোটি কোটি বছর ধরে চলছে।

আদি শঙ্করাচার্য বলেছেন -- **পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।** অর্থাৎ, বারবার জন্ম নেওয়া, বারবার মৃত্যু এবং বারবার মায়ের গর্ভে যন্ত্রণা সহ্য করা -- এই খেলাই চলছে। ওই চুরাশি লক্ষ যোনির মধ্যেই এই আসা-যাওয়া চলছে। সৎ কাজ করলে দেব যোনি , ঠিকঠাক কাজ করলে মনুষ্য যোনি এবং অধর্ম করলে কীটক যোনি --- এভাবেই আবর্তিত হয়। এটা তো জীবনের সার্থকতা নয়। এটা যেন একটা গোলকধাঁধা -- যার থেকে বেরনোর চেষ্টা করছি ; কিন্তু বেরতে পারছি না -- ঘুরেই যাচ্ছি ।

আমরা কখনও কোন বস্তুর জন্য আটকে থাকি অথবা কোন সম্বন্ধে। আর এই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, নিজের পাপ-পুণ্য , শুভ- অশুভ কর্মফলে জুড়ে গিয়ে বারবার বিভিন্ন যোনিতে ঘুরতে থাকি।

শ্রীভগবান এর থেকে ছাড়া পাওয়ার উপায় বলেছেন -- *অসঙ্গশস্ত্রেণ*- অসঙ্গ রূপ শস্ত্র।

শুকদেব মহারাজের একটা ঘটনা বলা যায় । মহামুনি শুকদেব ছিলেন মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র -- যিনি রাজা পরীক্ষিৎ কে প্রথমবার ভাগবত কথা শুনিয়েছিলেন। মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই তিনি তপস্যা করতে চলে গিয়েছিলেন । পরে ব্যাসদেব ভাগবত কথা শুনিয়ে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। একবার কোন একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য ব্যাসদেব পুত্রকে রাজা জনকের কাছে পাঠিয়েছিলেন । আমরা রাজা জনক কে চিনি মাতা সীতার পিতা হিসাবে । কিন্তু জনক আসলে একটা পদ। ভাগবতে তিয়াত্তর জন জনকের নাম পাওয়া গেছে । শ্রী সীরধ্বজ জনক ছিলেন সীতা মায়ের পিতা ।

শুকদেবের কিন্তু ব্যাপার টা ভালো লাগেনি... এতো বড়ো মহাত্মার পুত্র - যিনি চারটি বেদ রচনা করেছেন ; আঠারো টি পুরাণের রচয়িতা মহামতির পুত্র হয়ে কিনা একজন ক্ষত্রিয়ের কাছে যেতে হচ্ছে জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য !! তবুও পিতার আজ্ঞা পালন করার জন্য মিথিলার রাজদ্বারে এসে অহংকারের সাথে নিজের পরিচয় দিলেন দ্বারপালকে। মহারাজাকে গিয়ে বলো -- ব্রহ্মলীন, তত্ত্ববিদ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহামুনি বেদব্যাসের পরমপ্রিয় শিষ্য ব্রহ্মচারী, সর্বজ্ঞ , বেদজ্ঞানী , তপস্বী , শাস্ত্রানুচারী, গুণাতীত শুকদেব মহামুনি তাঁর দর্শন পেতে এসেছেন। দ্বারপাল তাড়াতাড়ি গিয়ে মহারাজ কে খবর দিলো। মহারাজা জনকের কাছে কোন সাধু- মহাত্মা এলে সর্বদা তিনি নিজে গিয়ে আদর করে নিয়ে আসেন। কিন্তু, এঁনার পরিচয় শুনে বললেন -- গিয়ে বল -- মহারাজ এখন ব্যস্ত আছেন... অপেক্ষা করতে হবে । দ্বারপাল খুবই সঙ্কোচের সাথে সেকথা শুকদেব কে জানালো। শুনে তাঁর মনে আঘাত লাগলো --- আমার পরিচয় জেনেও আমাকে প্রতীক্ষা করতে বললেন ! তিনি সংযত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন ।

পরের দিন অন্য এক দ্বারপাল -- শুকদেবের মনে হলো এতো বড়ো উপাধি বলার প্রয়োজন নেই। তিনি দ্বারপাল কে বললেন -- মহারাজ কে গিয়ে বলো যে মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্র ব্রহ্মলীন, তত্ত্ববিদ , জ্ঞানী মহাত্মা , সর্ব শাস্ত্রবেত্তা, গুণাতীত , তেজস্বী, তপস্বী শুকদেব মহামুনি এসেছেন পরিচয় আগের থেকে কম হলো দ্বারপাল মহারাজাকে জানালো। জনক জী বললেন -- ওঁনাকে প্রতীক্ষা করতে বলো ; আমি এখন ব্যস্ত আছি।

প্রতিদিন এভাবে রাজা জনক তাঁকে প্রতীক্ষা করতে বলেন ; শুকদেব মহামুনি ও দ্বারে অপেক্ষা করেন । প্রতিদিন দ্বারপাল বদল হয় ... প্রতিদিন শুকদেব জী নিজের পরিচয় কিছুটা ছোট করে বলেন । এভাবে ছয়দিন কেটে গেল ।

সপ্তম দিনে শুকদেব জী দ্বারপাল কে বললেন -- মহারাজ কে গিয়ে বলো জঙ্গল থেকে শুকদেব এসেছে রাজা জনকের কাছে দীক্ষা নিতে।

যখন সমস্ত উপাধি ত্যাগ করে ফেলে, কেবল জ্ঞানাকাঙ্খী শিষ্য রূপে উপস্থিত হলেন... তখন জনক জী স্বয়ং গেলেন তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসতে । তাঁকে পাদ্য- অর্ঘ্য দিয়ে স্বাগত করলেন । তাঁর খাদ্য - পানীয়ের ব্যবস্থা করলেন ;। বললেন -- আপনি খুবই শুভদিনে এখানে পদার্পণ করেছেন । আজ আমাদের দেবী পূজার দিন । আজ কোন ব্রহ্মচারী কে তেলভরা পাত্র নিয়ে সাতবার রাজ্য প্রদক্ষিণ করতে হয় । আপনি এই শুভ কাজের উপযুক্ত ব্রহ্মচারী ।

খুব সাবধানতার সঙ্গে শুকদেব জী তেলভরা পাত্র নিয়ে রাজ্য প্রদক্ষিণ শুরু করলেন -- যাতে এক ফোঁটা তেল ও না মাটিতে পড়ে। প্রদক্ষিণ শেষে বাদ্য সহকারে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন সবাই। রাজা জনক তাঁকে পূজা করলেন ; দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন ; বললেন -- মহারাজ! আপনার মতো ব্রহ্মচারীর দর্শন পেয়ে ধন্য হলাম । তারপর জিজ্ঞাসা করলেন -- এখন বলুন -- আমাদের রাজ্য কেমন লাগলো আপনার ? শুকদেব জী বললেন -- আমার সমস্ত মন ছিল ওই তেলের পাত্রের দিকে -- যাতে এক বিন্দু তেল ও না পড়ে যায়। আমি অন্য কিছু দেখিনি। রাজা জনক বললেন -- আপনার জ্ঞানের প্রথম শিক্ষা পূর্ণ হয়েছে। শুকদেব আশ্চর্য হয়ে তাকালেন। রাজা বললেন --
जो जग में रहो तो ऐसे रहो, ज्यों जल में कमल का फूल रहे।

এর তাৎপর্য হলো -- যে সংসারে সমস্ত মন পরমাত্মার প্রতি রাখে, তাঁর ভজনা করে , সে শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। পদ্মফুল জলে জন্মেও কখনো জল স্পর্শ করে না। তার উপরে জল ঢালা হলেও তা পিছলে পড়ে যায় । একইভাবে সংসারে থেকেও ভোগের প্রতি নিরাসক্ত থাকতে হবে। এইভাবে রাজা জনক শুকদেব জী কে সাতদিনে সাতটি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

15.4

ততঃ(ফ্) পদং(ন্)তৎপরিমর্গিতব্যং(য়্ঁ),
য়স্মিন্গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং(ম্) পুরুষং(ম্) প্রপদ্যে,
য়তঃ(ফ্) প্রবৃত্তিঃ(ফ্) প্রসৃতা পুরাণী॥15.4॥

তারপর সেই পরমপদ পরমাত্মা, যাঁকে প্রাপ্ত হলে মানুষ আর ইহ জগতে ফিরে আসে না এবং যাঁর হতে অনাদিকাল থেকে এই সৃষ্টি বিস্তারলাভ করেছে—'আমি সেই আদি পুরুষ পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি' এই বলে তাঁর অন্বেষণ করতে হয়।

শ্রীভগবান বলেছেন --হে অর্জুন! বৈরাগ্য রূপ শস্ত্র দ্বারা নিধন করতে হবে এবং তারপর সেই পরমপদ পরমাত্মা কে অন্তর দিয়ে পূজা করতে হবে। যাঁকে প্রাপ্ত করার পরে মানুষ আর এই দুঃখের সংসারে ফিরে আসে না তথা যে পরমেশ্বর দ্বারা এই সংসার বৃক্ষের সৃষ্টি এবং বিস্তার ঘটেছে -- সেই আদি পুরুষের শরণাগত হওয়ার জন্য দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে সেই ঈশ্বরের মনন ও নিদিধ্যাসন করতে হবে। যে জ্ঞানী এইরূপ নিদিধ্যাসন -মনন করেন -- তাঁর স্থিতি শ্রীভগবান পরের শ্লোকে বলেছেন।

15.5

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা,
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ(স্) সুখদুঃখসংজ্ঞৈ,
র্গচ্ছন্ত্যমূঢাঃ(ফ্) পদমব্যয়ং(ন্) তত্।।5।।

যাঁরা অভিমান ও মোহবর্জিত হয়েছেন, যাঁরা সাংসারিক আসক্তিজনিত দোষগুলি জয় করেছেন, যাঁরা নিত্য পরমাত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, যাঁরা (স্বদৃষ্টিতে) সমস্ত কামনারহিত হয়েছেন, যাঁরা সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত, এরূপ (উচ্চ স্থিতিসম্পন্ন) মোহরহিত সাধক ভক্তগণ সেই অবিনাশী পরমপদ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ।

যে যোগী অথবা মহাত্মা নিজের জীবন এভাবে তৈরি করেন ; তাঁদের লক্ষণ কিরকম -- তা শ্রীভগবান এখানে বলেছেন ।

তিনি বলেছেন - যার মান-সম্মান তথা মোহ মায়া নষ্ট হয়ে যায় , যে আসক্তির কারণে করা দোষ কে জয় করে নিতে

পারে --- এখানে ভগবানের এই কথার তাৎপর্য হলো -- কিছু প্রিয় বস্তু থাকা বা কিছু প্রিয় খাবার খাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। যেমন - জিলিপি খাওয়াতে কোন সমস্যা নেই , কিন্তু জিলিপি খাওয়ার কয়েক দিন পরে যদি আবারও জিলিপি খাওয়ার সময় আগের জিলিপির কথা মনে আসে -- যে সেই জিলিপি খেয়েছিলাম --- অনেক বেশি সুস্বাদু ছিল । কখনো কখনো তো পাঁচ বছর পরেও সেই জিলিপির কথা মনে পড়ে যায় এবং জিভে জল এসে যায়--- এসবই হয় আসক্তির কারণে । এই যে স্মৃতিতে আটকে থাকা -- এটাই সমস্যা।

আমরা যখন কোন পদার্থ, ব্যক্তি বা বস্তুতে আটকে থাকি -- যেমন - আমার ঘর, আমার পতি, আমার পুত্র .... আমি তো এদের ছাড়া থাকতে পারবো না ; যারা আমার প্রিয়, শুধু তাদেরকেই যেন ভগবান ভালো রাখেন ... আমার কাছাকাছি রাখেন... এসবই হলো আসক্তি।

এরপরে শ্রীভগবান ব্যক্তির তৃতীয় অবস্থার কথা বলেছেন। অনেক সময় আমাদের সাথে এমন হয় যে পূজাতে খুব মন লাগে ... গীতা পাঠ করতে বা তার বিবেচন ও খুব মন দিয়ে শুনতে ইচ্ছা করে । আবার কখনও বা এসবে মোটেও মন লাগে না। শ্রীভগবান এদের ব্যাপারে বলেছেন যে এরা নিত্য নিরন্তর পরমাত্মার চিন্তাতেই মন রাখে।

চতুর্থ অবস্থার বিষয়ে বলেছেন যে সমস্ত কামনা থেকে নিবৃত হয়ে যায়। যদি তারা জিলিপি পায়, ক্ষীর পায় বা যদি শুধু রুটি পায় খাওয়ার জন্য ... তিনটি খাবারই তাদের কাছে সমান তৃপ্তির। নিজের মনের মতো খাবার পাওয়া যাক বা নাই যাক ... মনের মতো ব্যক্তি কাছে থাকুক বা নাই থাকুক... পরিস্থিতি অনুকূল হোক বা প্রতিকূল.. সব অবস্থাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে।

পঞ্চম অবস্থার কথা শ্রীভগবান বলেছেন -- তারা সুখ-দুঃখ নামের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এরূপ উচ্চকোটির মোহশূন্য সাধক এবং জ্ঞানীজন সেই অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত করে নেয় ।

15.6

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো, ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ
য়দগত্বা ন নিবর্তন্তে, তদ্ধাম পরমং(ম্) মম॥6॥

সেই পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশিত করতে পারে না এবং যাকে প্রাপ্ত হলে জীব আর এই সংসারে ফিরে আসে না, সেইটিই আমার পরম ধাম।

এবার শ্রীভগবান বললেন... হে অর্জুন! যে এই পরমপদ প্রাপ্ত করে -- সে আর এই সংসার চক্রে ফিরে আসে না। যেসব মানুষ স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক বা পিতৃলোকে যায় , অথবা মনুষ্যলোকে থাকে... তাদের আবার ফিরে আসতে হয়। অর্থাৎ, বর্ণিত চৌদ্দ লোকের যে কোন লোক থেকেই ফিরে আসতে হয় । কিন্তু যে আমাকে পরমধামে প্রাপ্ত করে তাকে আর ফিরে আসতে হয় না। এরপর তিনি পরমধাম সম্বন্ধে বলেছেন অর্জুন কে । --- এ হলো সেই ধাম যার প্রকাশ ঘটাতে না সূর্যের আলোর প্রয়োজন, না চন্দ্রমা অথবা অগ্নির প্রয়োজন আছে। এ নিজেই নিজের প্রকাশ করে -- সেই আমার পরমধাম ।

আজকের বিবেচন সত্র হরিনাম সংকীর্তনের সাথে সমাপন হলো ।

হরি শরণম ।। হরি শরণম ।। হরি শরণম ।।

:: প্রশ্নোত্তর পর্ব ::

প্রশ্নকর্তা - প্রভা দিদি
প্রশ্ন - মহাভারতের কাহিনি তে পাই যে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় অর্জুন ব্রাহ্মণ বেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন এবং দাদা বলরাম কে বলেছিলেন -- ওই হলো অর্জুন । আমার প্রশ্ন হলো -- সেই

সভায় উপস্থিত সকলে নিজের নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন -- অর্জুন ও নিশ্চয়ই নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন ; না কি ব্রাহ্মণদের আলাদা করে পরিচয় দিতে হতো না?

উত্তর - অর্জুন ও নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন , কিন্তু একটু ঘুরিয়ে -- নিজেকে ব্রাহ্মণ পুত্র হিসাবেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন । অর্জুন কে কেউ চিনতে পারেনি আর, স্বয়ংবর সভায় কারও প্রবেশ নিষেধ ছিল না -- সেই কারণেও অর্জুন সেখানে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন এবং নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছিলেন। অর্জুনের দৈবীয় রূপ দেখে রাজা দ্রুপদ মুগ্ধ হয়েছিলেন , দ্রৌপদী ও এতো মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন যে অর্জুন কে কেউ আর তার পুরো পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন নি ।

প্রশ্নকর্তা - অনন্যা দিদি

প্রশ্ন

(১) - দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে কোন কাজ কর, এবং ভুলে যাও... অথবা এটা কখনো মনে করবে না যে এই কাজটা আমি করেছি । কিন্তু, আমি সদ্য যে অফিসে জয়েন করেছি - সেখানে বলা হয় -- যে যা কাজ করেছ -- তা দেখানো উচিত । নিজেদের কাজের বিবরণ লিখে রাখুন এবং সবাই কে দেখান। আমার কি করা উচিৎ ?

উত্তর - এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন। এই সমস্ত কথায় ক্রিয়ার গুরুত্ব দেওয়া নেই.. ভাবের গুরুত্ব আছে। ভাবতে হবে এইভাবে যে আমি কিছু করি নি, বরং ঈশ্বর করিয়েছেন। কিন্তু, ঈশ্বর এসব কাজ এই শরীর দ্বারা করিয়েছেন , সুতরাং পরিচয় এই শরীরের থাকবে । এই শরীর এ-ই কাজ করেছে -- এটা মেনে নিয়ে সবাই কে একথা জানালেও অন্তরে আমাদের ভাবনা সেটাই থাকবে যে আমি নয়... ঈশ্বর আমাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছেন। আমার মনে শরণাগতি থাকুক ; কর্মস্থলে যেরকম নিয়ম, যা বিবরণ দিতে হয় , দেওয়া যায় ।

প্রশ্ন (২) - গীতায় যা কিছু বলা হয়েছে তা কি কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্য -- না কি অন্য কোন ভগবানের জন্যও প্রযোজ্য ?

উত্তর - সম্পূর্ণ মহাভারতে আঠারো টি পর্ব আছে এবং এক লক্ষ শ্লোক আছে । মহাভারতের যেখানে শ্রীকৃষ্ণের কথা আছে -- ভগবান বেদব্যাস লিখেছেন -- হয় **বাসুদেব উবাচ** ; বা **কৃষ্ণ উবাচ**, **কেশব উবাচ** ইত্যাদি। কিন্তু পঁচিশ অধ্যায় থেকে বিয়াল্লিশ অধ্যায় -- এই আঠারো অধ্যায়ে তিনি শুধু **"শ্রীভগবানুবাচ"** লিখেছেন। এর কারণ এখানে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন তা **"ভগবৎস্বরূপম্"** বা **পরমাত্মা** রূপে বলেছেন । এজন্য -- যার ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্র... সে শ্রীরাম উবাচ বলবে , যার ইষ্টদেবতা শিবজী সে শ্রীশিব উবাচ বলবে। যার যার ইষ্টদেবতার নামে বলতে পারে। আমাদের এই ভাব নিয়ে গীতা পাঠ করতে হবে যে আমাদের ইষ্টদেবতাই এটা বলছেন।

প্রশ্নকর্তা - সাধনা দিদি

প্রশ্ন - আপনি বললেন যে জনক রাজার কথা বলছেন তিনি সীতা মায়ের পিতা নন। কিন্তু মিথিলার কথাই তো বললেন ।

উত্তর - এটা মিথিলার ই পরম্পরা ছিল। মিথিলা নগরের বংশানুক্রমে তিয়াত্তর জন জনক ছিলেন। যাঁরা সিংহাসনে বসেছেন তাঁদের কে ই জনক বলা হতো। সীতা জী'র বাবা ছিলেন জনক সীরধ্বজ।

প্রশ্নকর্তা - মোনিতা দিদি

প্রশ্ন - আমার প্রশ্ন হলো -- মহাভারতের রচয়িতা কি ত্রেতা যুগেও ছিলেন ? আলাদা আলাদা যুগে কি একই মুনি ?

উত্তর - শ্রীবেদব্যাস জী একজন ই। এবং তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সময় ছিলেন না। এনার সময়ের জনক রাজা অন্য কেউ ছিলেন ।

প্রশ্নকর্তা - গরিমা দিদি

প্রশ্ন - গীতা পাঠ করার সাথে সাথে তা বোঝা এবং গ্রহণ করা উচিৎ। গীতায় বলা হয়েছে আমাদের কারও প্রতি দ্বেষ ভাব রাখা উচিৎ নয়... কিন্তু কিছু কিছু মানুষ পশুদের মতো ক্রুর এবং অমানবিক ব্যবহার করে... তাদের প্রতি তো দ্বেষ আপনিই এসে যায় ; খুবই আঘাত লাগে মনে। এর থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় ?

উত্তর - মূল কথা বা আপ্তবাক্য হলো -- পাপ কে ঘৃণা কর' ; পাপী কে নয়। খারাপ কাজ যে করেছে সেই কাজ কে

ঘৃণা করা উচিৎ। কেউই পুরোপুরি খারাপ হয় না । আমরাও হয়তো অনেক খারাপ কাজ করে ফেলি --- তাহলে কি আমরাও ঘৃণার যোগ্য ? সব প্রাণীই ঈশ্বরের সন্তান। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অঙ্গদকে দূত হিসাবে লঙ্কায় পাঠিয়েছিলেন। অঙ্গদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন -- প্রভু! ওখানে গিয়ে আমি কি বলবো ?? রামচন্দ্র বললেন... তুমি গিয়ে বলবে --

काजु हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु बतकही सोई॥"

নিজের কাজও হবে এবং তার ও ভালো হবে । আমার পত্নীকে যে অপহরণ করেছে -- তার বিচার করবেন স্বয়ং ভগবান । শ্রীরামের তো উচিত রাবণ কে ঘৃণা করা। কিন্তু তিনি তা করেন নি । বরং নিজের কাজ সম্পন্ন করার সাথে তার ও ভালো চেয়েছেন। এজন্যই তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম -- কারণ, তিনি শত্রুর ও মঙ্গল কামনা করেন । আমাদের মনে দ্বেষ আসবে এটা স্বাভাবিক ; কিন্তু আমাদের উচিত নয় কাউকে দ্বেষ করা ।

আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

https://vivechan.learngeeta.com/feedback/

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!
আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!
সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!
Let's come together with the motto of Geeta Pariwar, and gift our Geeta Classes to all our Family, friends & acquaintances

https://gift.learngeeta.com/

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

https://vivechan.learngeeta.com/

|| গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ||
|| ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ||